‘কুয়োর ব্যাঙের বিশ্ব ভাবনা’

বন্যা আহমেদ

ক’দিন ধরে বারবারই খালি ‘কুয়োর ব্যাঙ’ কথাটা মনে পড়ছে - এ ধরণের শব্দ, বাগধারা, প্রবাদ, প্রবচনগুলো তো আর হঠাৎ করে তৈরি হয়নি কোন ভাষায়! মানব সভ্যতার বহুকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি এগুলো, ভাব প্রকাশে এদের জুড়ি মেলা ভার। আসলেই তো ব্যাপারটা সত্যি! যে ব্যাঙটার জন্ম হয়েছে কুয়ায়, জীবন কেটেছে কুয়ার সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে, বাইরের জগৎটা যে কোনদিন দেখেনি, সে যখন সমগ্র পৃথিবীটা নিয়ে চিন্তা করতে বসবে, নিজের উৎপত্তি, অতীত, বর্তমান, ভবিষৎ নিয়ে ভাবতে বসবে, তার দৌড় কতদুর যেতে পারে ভেবে দেখুন তো? সে নিজেকে সমগ্র পৃথিবীটার কেন্দ্রবিন্দু মনে করবে না তো কি করবে? এর বাইরে সে যাবে কি করে? কুয়ো থেকে বের হয়ে না আসা পর্যন্ত তার কাছ থেকে অন্য কিছু আশা করাও বাতুলতাই মাত্র। এর জন্য তাকে দোষী করলে তার ওপর ঠিক সুবিচার করা হয় বলে মনে হয় না। মানব সভ্যতার ইতিহাসটাও অনেকটা বোধ হয় এরকমই!

আমাদের এই মহাবিশ্ব প্রায় ১৪ শ’ কোটি বছর আগে সৃষ্টি হলেও আমাদের এই বুড়ো পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে প্রায় সাড়ে ৪ শ’ কোটি বছর আগে। এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, প্রাণের জন্ম হতে লেগে গিয়েছিলো আরও প্রায় একশো কোটি বছর। আর মানুষ সৃষ্টি? সে তো সে দিনকার কথা! আদিম এক কোষী প্রাণ, ব্যকটেরিয়া, বহুকোষী প্রাণী, অ্যালজি, অমেরুদন্ডী প্রাণী, বিভিন্ন মেরুদন্ডী প্রাণীর উৎপত্তি ও বিকাশের ধাপ বেয়ে, বিবর্তনের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে মানুষ নামের এই প্রজাতিটি যখন সৃষ্টি হল তখন বাকি সাড়ে ৩’শ কোটি বছরের সবটাই প্রায় ফুরিয়ে গেছে। ৪০-৮০ লাখ বছর আগে এক ধরনের এপ (বন মানুষ) প্রজাতি দুই পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াতে শিখলেও তার থেকে আমাদের অর্থাৎ আধুনিক মানুষের উদ্ভব ঘটেছে মাত্র লাখ খানেক বছর আগে। ভূতাত্ত্বিক নিয়মে হিসাব করলে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের ব্যাপারটা এক্কেবারে আনকোরা। পৃথিবীর বয়স যদি একদিন বা ২৪ ঘন্টা ধরে নেওয়া হয়, তবে মানুষ নামের এই তথাকথিত সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিটির জন্ম হয়েছে ২৪ ঘন্টা ফুরানোর মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগে!

আর এ নিয়েই আমাদের গর্বের শেষ নেই! হাজারো প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে, ডাইনোসরের মত অতিকায় প্রাণী বহুকাল ধরে পৃথিবীর বুকে রাজত্ব করেও শেষ পর্যন্ত হারিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে, অথচ আমরা দিব্যি টিকে আছি, অদুর ভবিষ্যতেও আরও বেশ কিছু কাল টিকে থাকবো বলেই মনে হচ্ছে - এটা নিয়ে গর্ব করা যায় বৈ কি! আসলে মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসটা একটু অদ্ভুতই, অন্য প্রাণীদের থেকে একটু অন্যরকম সেটা স্বীকার করে নিতেই হবে! একদিক দিয়ে বিচার করলে, তা অন্যান্য সব প্রাণীর মতই প্রকৃতির নিয়মে বিবর্তনের ধারায় ঘটে যাওয়া এক আকস্মিক ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়, আর অন্যদিকে থেকে চিন্তা করলে তা হচ্ছে অকল্পনীয় বুদ্ধিমত্তা, ভাষা ও সভ্যতা বিকাশের এবং প্রকৃতির সাথে টেক্কা দেওয়ার এক অনন্য ইতিহাস। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা প্রথমবারের মত শুধু যে দুই পায়ের উপর ভর করে দাঁড়ালো তাই তো নয়, মস্তিষ্কের বিবর্তনও ঘটতে শুরু করলো তাদের। অপেক্ষাকৃত বড় এবং উন্নত মস্তিষ্ক নিয়ে সে নিজের অস্তিত্ব, টিকে থাকা, সৃষ্টিরহস্য নিয়ে ভাবতে শুরু করলো। আর সবার মত প্রকৃতির অধীন হয়ে থেকে তার তো আর পোষালো না, সে আরও অনেক বেশী জানতে চায়, বুঝতে চায়, নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রন করার ক্ষমতা চায়, প্রকৃতিকে জয় করতে চায়। প্রকৃতির বিশালত্ব, নির্মমতা, হিংস্রতার সামনে ‘অসহায় কিন্তু বুদ্ধিমান’ মানুষ নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অনবরত লড়াই করেছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে আবার তার সামনেই মাথা নুইয়ে তৈরি করেছে অসংখ্য কল্পনার মন্দির। সহজাত বুদ্ধি

আর অদম্য কৌতুহল আছে তার, কিন্তু অজ্ঞতা এবং সীমাবদ্ধতা তার থেকেও অনেক বেশী! ভেবে দেখুন তাদের অবস্থাটা, আমি বা আপনি কয়েক হাজার বছর আগে জন্মালেই বা কিভাবে ভাবতে পারতাম! আসলেই তো অবাক করা ব্যাপার - চারদিকে ফুলে ফলে সম্পদে ভরা পৃথিবী, তেষ্টা মেটাতে, বেঁচে থাকতে, ফসল ফলাতে পানির দরকার, অজানা কারণে বৃষ্টি হয়ে তা ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে, তাকে তাপ দেওয়ার জন্য সূর্য উঠছে একদিকে, দিনের শেষে ডুবে যাচ্ছে আরেক দিকে - এর সবই তার জন্য তৈরি নয় তো কি? আবার ওদিকে আগুন, মহাপ্লাবন, বজ্রপাত, সাইক্লোনগুলো কি যেনো এক আজানা কারণে শাস্তি দিয়ে যাচ্ছে তাদের! মহাবিশ্বের ছোট্টো এক গ্রহের ছোট্টো এক কোণা থেকে আরও ছোট্টো মানুষ প্রজাতি তার চারদিকের প্রকৃতি এবং মহাবিশ্বের বিশালতায় পুলকিত, অভিভুত এবং ভীত! আর তা থেকেই সে সৃষ্টি করেছে অসংখ্য পুজার বেদী, প্রার্থনার মসজিদ, মন্দির, গির্জা, অলৌকিক সব সৃষ্টিকর্তা, দেব দেবী আর তারপর মহা গর্বে আর মিথ্যা আস্ফালনে নিজেকে বসিয়েছে তার কেন্দ্রে। মহাবিশ্বের সমস্ত আয়োজনের উপলক্ষ্য নাকি সে, সেই সর্বশ্রেষ্ট সৃষ্টি, সূর্যসহ সব গ্রহ নক্ষত্র তার এই পৃথিবীকে ঘিরেই ঘুরছে। সৃষ্টি রহস্যের প্রাচীন মিথগুলো পড়ে হয়তো আমরা আজকে হাসি, কিন্তু গন্ধম ফল, শয়তান, আদম হাওয়া, দেব দেবী, পুজার গল্পগুলো যে এখনও সদম্ভে টিকে আছে আমাদের মস্তিষ্ক জুড়ে তা ভেবে দেখি না। কিছুদিন আগে মিশরের এক ফেরাউনের কয়েক হাজার বছরের পুরনো সমাধি খুঁড়ে বিচিত্র সব জিনিষ পাওয়া গেছে, নরবলি দেওয়া কঙ্কাল থেকে শুরু করে ৭০ ফুট লম্বা ১৪টি নৌকার পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া গেছে। পরজন্মে রাজাদের দাস দাসী তো লাগবেই, তার সাথে নৌকাগুলোও রেখে দেওয়া হয়েছিলো যাতে চড়ে ফেরাউনের আত্মা পরপারে পারি জমাবে! পৃথিবীর আনাচে কানাচে, সব জাতি, গোষ্ঠি, সমাজ তার নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে, বহুকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি করেছে বিভিন্ন সৃষ্টিতত্ত্ব, আর সামাজিক নিয়মগুলোকে তার সাথে বেঁধে দিয়ে বলেছে এটাই ধর্ম, এটাই একমাত্র জীবন বিধান (তবে যখন দেখি ফেরাউন থেকে শুরু করে মর্তলোকের সব দেব, দেবতা, নবী, রসুল, পীর, রাজা, রোমান পোপ পর্যন্ত নিজেকে সেই সৃষ্টি কর্তার পাঠানো বিশেষ প্রতিভু বলে দাবী করে সুবিধা লোটে তখন অবাক হয়ে ভাবি সাধারণ মানুষ না জানলেও এরা তো ঠিকই জানতো যে এর সবই ভাওতাবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়!)। আরও মজার কথা হচ্ছে এরা সবাই বলছে শুধু তার ধর্মই ঠিক, আর বাকি সবাই নাকি ভুল! কৌতুহুলী মন প্রশ্ন না করে পারে না তাহলে আসলেই ঠিক টা কে? ভেবে দেখুন তো, তাদেরকে দোষ দেই কি করে, কূপমন্ডুকের কল্পনা আর কতদুরই বা যেতে পারে, মোল্লার দৌড় তো মসজিদ পর্যন্তই! কুয়োর ব্যাঙ এর কাছে কুয়োটাই তো তার পৃথিবী, এর বাইরে সে যাবে কি করে, কি করে সে জানবে সমুদ্র কত বড় হয়!

তাই আমরা সাধরণ মানুষেরা যখনই ছকের বাইরে কিছু শুনি তখনই দিশেহারা হয়ে উঠি। আর ওদিকে ধর্ম, রাজনীতি এবং দেশের ক্ষমতাধারীরা আঁতকে ওঠেন, এই বুঝি থলের বিড়াল বেরিয়ে গেলো। কয়েক শতাব্দী আগে কোপার্নিকাস যখন বললেন পৃথিবী তো আসলে সব কিছুর কেন্দ্র নয়, সে বহু গ্রহের মত একটা ছোট গ্রহ, সূর্যের চারিদিকে ঘুরে চলেছে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে। তখন যেন আমাদের মাথায় বাজ পড়লো। এত বড় কথা! বললেই হোল নাকি আমরা এই মহাসৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু নই! ক্ষিপ্ত রোমান চার্চ্চ পুড়িয়ে মারে ব্রুনোকে, গৃহবন্দী করে গ্যালেলিওকে। কিন্তু একবার যখন চিন্তার কুয়ো থেকে মানুষ বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে তখন তাকে আর থামাবে কে? মানুষ নামক আমাদের এই প্রজতিটার কোন কিছু নিয়ে যদি গর্ব করার অধিকার থেকে থাকে তা হচ্ছে তার এই অনন্ত কৌতুহল, নিজেকে এবং প্রকৃতিকে জানার অদম্য ইচ্ছে আর প্রগতির জন্য অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। কোপার্নিকাসের পর মানব সভ্যতা আর পিছন ফিরে আর তাকায়নি, শত বাঁধা অতিক্রম করে এগিয়ে গেছে, জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোয় সে সব কিছুকে ঝালিয়ে নিতে শুরু করেছে বারবার। তাই ডারউইন যখন বললেন ‘পৃথিবী তো বটেই, মানুষও সৃষ্টির কেন্দ্র নয়, আমরা আর সব প্রাণের মতই প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় এখানে

এসে পৌঁছেছি’ তখন তার প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে তা সহজেই বোধগম্য। কিন্তু ভুলে গেলে তো চলবে না যে বহু বাঁধার মুখেও আমাদের একটা অংশকে তো থামিয়ে রাখা যাবে না, প্রকৃতিই আমাদেরকে দিয়েছে কৌতুহুলী হওয়ার মূল্যবান বৈশিষ্ট্য। ডারউইনের পর গত দেড়শো বছরে নদীর জল গড়িয়ে গেছে বহুদুর, সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখার - অনু-জীববিদ্যা, জেনেটিক্স, জিনোমিক্স। খালি চোখে যা দেখা যায় না তা দেখার ব্যবস্থাও করে ফেলেছেন বিজ্ঞানীরা, শক্তিশালী টেলিস্কোপ দিয়ে আজকে আমরা দেখছি মহাকাশে নবীন গ্যালাক্সির সৃষ্টি, জীব-বিজ্ঞানীরা চোখে অনুবীক্ষন যন্ত্র লাগিয়ে দেখছেন মানুষের কোষের গঠন, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ডি এন এ বা জীনের গঠন, ভূতত্ত্ববিদরা জেনে গেছেন কিভাবে পৃথিবীর বয়স নির্ধারণ করতে হয়, ফসিলবিদরা বুঝে গেছেন কি করে সঠিকভাবে পড়তে হয় কোটি বছর ধরে পৃথিবীর বুকে আগলে রাখা ফসিল রেকর্ডের ডাটাগুলো! মানব সভ্যতা প্রথম বারের মত চিন্তার অচলায়তন ভেঙ্গে বের হয়ে আসতে শুরু করেছে। অবাক বিস্ময়ে বুঝতে শুরু করেছে তারা তো এই প্রাকৃতিক বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্ট প্রকৃতির নিমিত্ত বা কেন্দ্র নয়ই বরং এই দীর্ঘ সৃষ্টি প্রবাহের এক্কেবারের শেষের দিকের ’বহুর মধ্যে এক’ বৈ আর কিছুই নয়!

আজকে বিবর্তনবাদ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব, জীববিজ্ঞানের মূল খুঁটিগুলোর একটি। বিবর্তনবাদের ধারণা ছাড়া জীববিজ্ঞানের সব শাখাই অচল। আমরা জানি যে, প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি বছর আগে এই পৃথিবীতে শুরু হয়েছিলো এই প্রাণের মেলা, সেখান থেকেই বিবর্তিত হতে হতে পৃথিবীর বর্তমান এবং অতীতের সব প্রাণের উদ্ভব ঘটেছিলো। এই বিবর্তনের গতি অনির্ধারিত এবং অনিশ্চিত। কখন, কিভাবে ঘটবে তা আগে থেকে বলে দেওয়ার কোন উপায় নেই, সে চলে তার প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে। জীবের দেহে আকস্মিক পরিবর্তনগুলোর (Mutation) উপর নির্ভর করে এই নিয়মগুলোর প্রয়োগ ঘটে। আমাদের মানুষ নামের এই প্রজাতিটি আজকে এখানে নাও থাকতে পারতো। আমাদের অস্তিত্বটা অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক হলেও নির্ধারিত ছিলো না কখনই। বিজ্ঞানীরা যদি সেই সাড়ে তিনশো কোটি বছর আগের প্রাণ সৃষ্টির পার্থিব অবস্থাটা তৈরি করে আরেকবার বিবর্তনের ধারাটি প্রত্যক্ষ করতে চান তাহলে কোন মতেই আর একই ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে। হ্যা, ঠিকই ধরেছেন, অন্যান্য সব প্রাণীর মতই আমাদের সৃষ্টিও কোন পূর্ব-নির্ধারিত ব্যাপার নয়। আমরা আজকে এখানে আছি কোন নীল নক্সার ফলশ্রুতিতে নয়, বরং ঠিক তার উলটো কারণে। বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় ঘটনাগুলো যেভাবে ঘটেছে তা না ঘটলেই আজকে আর আমরা এখানে থাকতাম না। প্রখ্যাত বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী এবং ফসিলবিদ স্টিফেন যে গুলড্ তাই বলেছিলেন, *"Humans are not the end result of predictable evolutionary progress, but rather a fortuitous cosmic afterthought, a tiny little twig on the enormously arborescent bush of life, which if replanted from seed, would almost surely not grow this twig again."*

অবাকই হতে হয় আজকে এখানে দাঁড়িয়ে বিগত পঞ্চাশ লক্ষ বছরের মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস দেখলে। আজকে জীববিজ্ঞানী, ফসিলবিদদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণের সাক্ষ্য রয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে তারা এঁকেছেন ৫০ - ৮০ লক্ষ বছরের ধারাবাহিক ছবিটি - এক ধরনের এপ বা বন মানুষ থেকে আমাদের আজকের মানব প্রজাতির বিবর্তনের একান্ত ইতিহাস। অথচ প্রায় দেরশো বছর আগে টি এইচ হাক্সলি এবং ডারউইন যখন প্রথম এই সম্ভাবনাটির কথা প্রস্তাব করেছিলেন তখন সারা বিশ্ব জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিলো। শুধু যে আমাদের প্রজাতিটিই নর বানর থেকে বিবর্তিত হয়ে এখানে পৌঁছেছে তা তো নয়, আমাদের এই মানুষ প্রজাতিটি ছাড়া আরও অনেকগুলো মানব প্রজাতিরও সন্ধান পাওয়া গেছে যারা এক সময় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। গত কয়েক লক্ষ বছরে আমাদের এই পৃথিবী কখনও কখনও একাধিক মানব প্রজাতির পদচারণায়ও মুখরিত হয়ে উঠেছিলো। এই তো মাত্র তিরিশ হাজার বছর আগেও

নিয়ানডারথাল প্রজাতির মানুষের সাথে বসবাস করেছি একই সাথে, আমরাই হয়তো তাদের বিলুপ্তির কারণ হয়েছি শেষ পর্যন্ত। বিজ্ঞানীরা ডি এন এ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে তারা আসলেই আমাদের প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলো না, তারা ছিলো সম্পুর্ন ভিন্ন প্রজাতির মানুষ! আমরা যেমন বিভিন্ন ধরনের বিচিত্র সব বাঘ বা পাখি বা বানরের প্রজাতি দেখি যারা নিজেদের মধ্যে প্রজননে সক্ষম নয়, ঠিক তেমনি মানুষেরও বহু প্রজাতি হেটে বেরিয়েছে একই সাথে এই পৃথিবীর বুকে। বিভিন্ন ধরণের তাদের মত ভাবতে একটু অবাক লাগলেও ব্যাপারটা কিন্তু সত্যি। এখন পর্যন্ত পাওয়া ফসিলগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রায় ৩২-৪০ লক্ষ বছর আগে আমাদের চারপেয়ে পুর্বপুরুষ বন মানুষদের একটা অংশ প্রথম দু'পায়ের উপর ভর করে হাটতে শুরু করেছিলো। ১৯৭৪ সালে নৃবিজ্ঞানী ডোনালড জোহানসন ইথিওপিয়ায় প্রথম এই ফসিলটি খুজে পান। পরে আরও অনেক ফসিল পাওয়া গেছে এই প্রজাতির। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছিলেন *Australopithecus Afrensis*. আমাদের আধুনিক মানুষের ফ্যমিলির নাম হচ্ছে 'হমিনিড' - এর অন্তর্ভুক্ত হতে হলে আপনাকে দুই পায়ে ভর করে দাঁড়াতে পারতে হবে! আর এই *Australopithecus Afrensis* - রাই হচ্ছে এখন পর্যন্ত পাওয়া তার প্রথম নিদর্শন। দু'পায়ে ভর করে মাটিতে দাঁড়াতে পারলেও তারা আফ্রিকার সাভানার গাছের ডালে ডালেও দিব্যি ঘুরে বেড়াতো। এর পর পরই আমরা পৃথিবীর আবহাওয়ায় এক বিশাল পরিবর্তন দেখতে পাই। পৃথিবীর অক্ষ পথের পরিবর্তনের ফলে ঠান্ডা বাড়তে থাকে, আর তার ফলে আফ্রিকার জংগলগুলো দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যায়। প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মেই যারা এই নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিলো তারাই শুধু টিকে গেলো। তাই ৩০ লক্ষ বছর আগে আমরা দেখি, *Paranthropus boisei* র মত নতুন প্রজাতি যারা মরুভুমি এবং তৃণভুমির শক্ত বাদাম বা মুল জাতীয় খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকার ক্ষমতা অর্জন করেছে। প্রায় একই সময়ে আফ্রিকার পূর্ব দিকে *Homo habilis* নামে আরেক ধরনের প্রজাতির মানুষ দেখা যায় যারাই বোধ হয় প্রথম পাথুরে যন্ত্র তৈরি করতে শিখেছিলো, নিজেরা শিকার না করলেও মাংস খেতে শিখেছিলো। মাংসে অনেক বেশি পুষ্টি ও ক্যালোরি আর সহজেই হজম হয় বলে তার আর পূর্বপুরুষদের মত বিশাল বড় ক্ষুদ্রান্তের প্রয়োজন রইলো না। বিজ্ঞানীরা মনে করেন তার ফলে শরীরের যে এনার্জি বেঁচে গেলো তা ব্যবহৃত হলো বড় মস্তিষ্ক সৃষ্টিতে। প্রায় বিশ লক্ষ বছর আগে আমরা প্রথম 'আমাদের' মত দেখতে মানুষ প্রজাতিগুলোর উদ্ভব দেখি। এই *Homo ergaster*,

Australopithecus Afrensis
(3.9 - 3.0 million years ago)

Paranthropus boisei
(~ 3 million years ago)

Homo ergaster
(~ 2 million years ago)

Homo erectus দের মস্তিষ্ক বেশ বড়, তারা *Homo habilis* এর ভোতা অস্ত্রগুলোকে শান দিকে ধারালো করেছে; শরীরের লোম পড়ে গেছে, ঘামের জন্য প্রয়োজনীয় গ্ল্যান্ড তৈরি হয়েছে, গরম আবহাওয়ায় শরীর এবং মস্তিষ্কের তাপমাত্রা রক্ষা করার জন্য যার ভুমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ই ধারণা করা হয় যে মানুষের বিভিন্ন প্রজাতিগুলো আফ্রিকা ছেড়ে এশিয়া এবং ইউরোপে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। প্রায় এক মিলিয়ন বছর আগে *Homo heidelbergensis* দেখা যায় যারা মোটামুটি আমাদের মতই, এদের মস্তিষ্ক আমাদের মস্তিষ্কের ৯৩%, এরা ইউরোপে পৌছে গেছে, শিকার করতে শিখেছে। এর পর ইউরোপে আমরা যে *Neanderderthal* প্রজাতি দেখি তারা আমাদের পূর্বপুরুষ নয়, তারা সম্পুর্ন ভিন্ন প্রজাতির মানুষ এবং আমরা মাত্র ৩০ হাজার বছর আগে পর্যন্তও তাদের সাথে একই সাথে এই পৃথিবীতে বিচরণ করেছি। দীর্ঘ বরফযুগে তারা ইউরোপে অত্যন্ত কঠিন জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলো, তাদের মধ্যে গোষ্ঠিবদ্ধতা, ধারালো অস্ত্রের ব্যবহার, ছবি আঁকা এবং ধর্মীয় আচারব্যবস্থার প্রচলন ঘটেছিলো বলে মনে করা হয়। পুরো সময়টা ধরেই বিশ্বজুড়ে জলবায়ুর চরম পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। খুব শীত এবং বরফ যুগগুলোতে মানব প্রজাতিগুলোর জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত কমে যেতো, হয়তো এভাবেই অনেকে বিলুপ্তও হয়ে গেছে; আবার গরম যুগে তাদের জনসংখ্যার স্ফিতি ঘটতো পৃথিবী জুড়ে। তারা ধীরে ধীরে পুর্ব দিকে ছড়িয়ে পরতে পরতে ৫০ হাজার বছর আগে নৌকা যোগে অস্ট্রেলিয়ায় পোঁছায় আর পশ্চিম দিকে দিয়ে ইউরোপে পোঁছায় প্রায় ৪০ হাজার বছর আগে। ৩০ হাজার বছর আগে তাদেরকে চীনে, এবং শ্রীলঙ্কায়ও দেখতে পাওয়া যায়। এরাই আমাদের আধুনিক মানুষের প্রজাতি, আর সব প্রজাতির মানুষ বিলুপ্ত হয়ে গেছে চিওরতরে এই পৃথিবীর বুক থেকে, টিকে গেছি শুধু আমরাই। আমরা এখানে শুধু মানুষের বিবর্তনের খুব সংক্ষিপ্ত একটা রূপরেখা দেখলাম। সারে তিনশো কোটি বছরের প্রাণের ইতিহাস দেখলে বোঝা যায়, কত আকস্মিক এবং অনির্ধারিত আমাদের এই জীবনের উৎপত্তি! হাজারো সম্ভাবনার ভীরে ঘটে যাওয়া একটা সম্ভাবনার ফসল আমরা। ধরুন, ৬৫ মিলিয়ন বছর আগে বিশাল এক পরিবর্তনের ফলে যদি তখনকাল প্রতাপশালী ডায়নোসররা বিলুপ্ত হয়ে না যেতো তাহলে কি আমাদের মত ক্ষুদ্র স্তন্যপায়ী প্রাণিরা এভাবে বিকাশ লাভ করতে পারতো? আমাদের

Homo heidelbergensis
(~1 million years ago)

Neanderderthals
(200,000 years - ~28,000 years ago)

Homo sapiens (us, the modern humans)
(150,000 years- present)

পুর্বপুরুষ প্রজাতিগুলোই হয়তো হারিয়ে যেতো ইতিহাসের পাতায়। তিন কোটি বছর আগেও আমাদের পুর্ব পুরুষেরা গাছের ডালে ডালে ঝুলে থেকেছে, মাত্র ৪০ লক্ষ বছর আগে তারা নেমে এসেছে মাটির বুকে, জন্ম দিয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির মানুষের। আজকে আমাদের এই আধুনিক মানুষের প্রজাতিটি সারা পৃথিবী জুড়ে একচ্ছত্র আধিপত্য চালালেও মাত্র তিরিশ হাজার বছর আওে আমাদের ভাগীদার ছিল সেই নিয়ান্ডারথাল প্রজাতি। তাদেরও আমাদের মতই বড় মস্তিষ্ক ছিলো, আমাদের বদলে তারাও হতে পারতো এই পৃথিবীর অধিশ্বর। বরফ জুগের ঘটনাগুলো যদি ঠিক এভাবে না ঘটে একটু অন্যভাবে ঘটতো, তাহলেই হয়তো আফ্রিকা থেকে বেরিয়ে এসে পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়তো না আমাদের আদিম পূর্বপুরুষেরা। নিয়ান্ডারথালরাই হয়তো রাজত্ব করতো আজকের পৃথিবীতে।

বিবর্তন বিরোধী বিশেষ করে ধার্মিক মোল্লা পুরুতদের একটা খুব প্রিয় যুক্তি হচ্ছে যে মানুষকে কেন্দ্রে বসিয়ে প্রচলিত ধর্মীয় বিধি বিধান অনুযায়ী জীবন না চলালে নাকি মানব সভ্যতার মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে যাবে। মানুষের আর বেঁচে থাকার, ভালো কাজ করার কোন অনুপ্রেরণা থাকবে না। কিন্তু ব্যাপারটা কি ঠিক তার উলটো নয়? অনেকেই আমাদের নিজেদের কল্পনায় বানানো এই সৃষ্টির মহত্ত্বকে ত্যাগ করতে ভয় পান - কিন্তু ভেবে দেখুন তো আজকে আমরা যতই নিজেদের সম্পর্কে জানতে পারছি, যতই বুঝতে পারছি যে 'আমরা প্রকৃতিরই একটা অংশ মাত্র, কেউ আমাদেরকে বিশেষভাবে ডিজাইন করে বানায়নি, কেউ আমাদের সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে এই মহাবিশ্বকে সাজায়নি' ততই কি আমাদের চিন্তার পরিসর বিস্তৃত হচ্ছে না, দায়িত্বশীল হওয়ার দায় বেড়ে যাচ্ছে না? কখনও কি ভেবেছেন যে সারাটা মহাবিশ্বই পড়ে রয়েছে আমাদের বুদ্ধিদীপ্ত পদচারণার অপেক্ষায় - হয়তো এরকম আরও মহাবিশ্বের পর মহাবিশ্ব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, হয়তো আমাদের মত জীবনের সমারোহে, প্রাণের স্পন্দনে মুখরিত হয়ে আছে আরও অনেক বিশ্ব! অতিকায় ডায়নোসররা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কেউ তো একবারও ফিরে তাকায়নি; কয়েকশো কোটি বছরের যাত্রাপথে আরও কোটি কোটি প্রজাতি বিলুপ্তির পথ ধরেছে, প্রকৃতি তো এক ফোটাও চোখের জল ফেলেনি; আমাদের প্রজাতিও হয়তো এক সময় হারিয়ে যাবে প্রাকৃতিক নিয়মেই। প্রকৃতি বা কোন আলৌকিক স্বত্তা আমাদের যাত্রাপথ নির্ধারণ করে দেয় নি, কেউ আমাদেরকে রক্ষা করার পবিত্র দায় নিয়ে বসে নেই। তাই আমাদের নিজেদের দায়িত্ব আজকে নিজেকেই নিতে হবে, নিজেদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই এক সুস্হ মানব সমাজ গড়ে তুলতে হবে, নিজেদের বিলুপ্তি ঠেকাতেই প্রকৃতিকে রক্ষা করতে হবে, নিজেদের অকল্পনীয় বুদ্ধিদীপ্ততার আলোয় বলিষ্ঠ হয়ে রহস্যময় এই 'প্রায় অচেনা' মহাবিশ্বের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হতে হবে। এই টিকে থাকার, বিকশিত হওয়ার, ছড়িয়ে পড়ার প্রাণের মেলায় আমরাই আমাদের সাথী, কান্ডারী এবং ত্রাণকর্তা। ঠিক যেমনটি বলেছিলেন স্টিফেন জে গুল্ড তার *Wonderful Life* (1989) বইটিতেঃ *"We are the offspring of history, and must establish our own paths in this most diverse and interesting of conceivable universes--one indifferent to our suffering, and therefore offering us maximal freedom to thrive, or to fail, in our own chosen way. "*

ডারউইন দিবসের শুভেচ্ছা সবাইকে,
বন্যা
২/১২/২০০৬